সুলেখা

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

অজপাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ি ঢুকল তখন সুলেখার কান্না এল। এই সে কলকাতায় ইস্কুলে-কলেজে পড়েছিল ?এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে ?কলকাতায় নীলিমাদের বাড়ি গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরণ্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল কাপড়ের জরির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ি গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভালো গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ-সবের এই পরিণতি ?

এই জন্যে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন ?না দিলেও পারতেন। আরো অল্প-বয়েসে বিয়ে দিলেও চলত। তার চোখ ফোটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেত অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্বামী শ্যামবর্ণ, অল্প বয়েস। বি.এ. পাশও করেচেন। কিন্তু হলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরি করেন, গল্প-গুজব করবার জন্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজ-পাড়াগাঁয়ে একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কতদূরে পড়ে রইল, ও এবার আই.এ. পাশ করবে—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন !

সে আটকে গেল ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েছে...

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে ওদের গাড়ি এসে পৌঁছল। কতকগুলো প্রাচীনা, কতকগুলো পাড়াগেঁয়ে-বউ, তাদের মুখে-চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে সুলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বউভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরো বিরক্তিকর হয়ে উঠত ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক বাড়িতে প্রাচীনাদের হাতে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পুজোর সময় আসবেন বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে সুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়ল। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কিভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়িদের মধ্যে ?যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল-গিয়ে-এককালে-ঠেকা দন্তহীন বুড়িদের মধ্যে !

টাকা ছিল না কাকার, নতুবা শহরে বিবাহ হত।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গরপছন্দ করেনি। ভালো ছেলে, পাশকরা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়ি জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা-জমি আছে, প্রজাপত্তর আছে, আগান-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকেলে গৃহস্থ।

শাশুড়ি সুলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকেলে মুড়কি-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন—বউমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ি আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিয়ো তোমার ছেলের বউকে—জন্ম-এইস্ত্রী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক।

সুলেখা শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হাড়ছড়াটা ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে ! গৌরী কি ভাববে, কলেজের অনুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয় ?

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্মে বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্যি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপেনি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা ক্ষার কাচে, খই-মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গেঁয়ো রান্না চচ্চড়ি, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবেজীবন নষ্ট করার কি মানে হয় ?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুশ্রী চেহারার জন্যে আর চমৎকার গানের গলার জন্যে যা মানিয়েছিল ওকে ! গৌরীর মা টিসু শাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরেজি অধ্যাপিকা তরুণী ঊষাদি গ্রীন্-রুমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের !

আজ মনে হচ্ছে কত কাল...

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হত ! থাকত সে ঊষাদির মতো, নলিনীদির মতো, মিস সেনের মতো, মিস বিধুবালা গাঙ্গুলির মতো অবিবাহিতা !

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটত বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুশি তুমি যাও, সিনেমা দ্যাখো, নাচগানের জলসা দ্যাখো ফার্স্ট ক্লাসে নিউ এম্পায়ারে—কি মজা !

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বললে—রাঙা-বউ, এক কাজ করতে হবে যে !

সুলেখা বললে—কি দিদি ?

—কলাইয়ের ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে, বুঝলে ?

—বেশ।

—পারবে তো ?

—করিনি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেচে। বেলা দুটোর সময় কালো ভোমরার মতো মেঘকরে নেমেচে ঝম্‌ঝম্ জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্চে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে তখনো সমানে বৃষ্টি হচ্চে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্তি করে ফেলেচে দু ঘণ্টার মধ্যে। সুলেখা উঠে চোখ মুছতে মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে শহরে দেখেনি কখনো। বকুল গাছের গুঁড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারে পাখিগুলো অঘোরে ভিজচে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম গরম চা। সে নতুন-বউ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে ?...ও-মাগো, ওদের বাড়ির বুড়িটা কি করে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে ! পাড়াগেঁয়েদের কাণ্ডই আলাদা।

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বললে—রাঙা-বউ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে ?

সর্বনাশ ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠল, অপ্রতিভ সুরে বললে—ওই যাঃ ! সেকথা মনেই নেই দিদি—এক্ষুনি আমি যাচ্ছি ছাদে—

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিল সে মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কি রকম আনাড়িই না মনে করছে ! তাকে 'স্মার্ট" বলে সবাই জানত কলেজে। সুলেখা ধড়মড় করে উঠে ছুট দিল ছাদের দিকে, ওর জা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে বললে—ছুটতে হবে না রাঙা-বউ, বোসো-বোসো !

—বসব কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল !

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই ! তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুমযে !

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে তার জা। মজা দেখবার মতো লোক নয়। ও বললে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে।

সুলেখার জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বললে—রাঙা-বউয়ের থিয়েটারি ধরনের কথা শুনে হেসে মরি ! ও-মাগো...

এ একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন বলে সুলেখা মেনে নিলে।

ডাল কখনো তোলেনি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়াগাঁয়ের লোকের মতো।

সেদিন সন্ধেবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বললে—কি হচ্ছে গো বউদিদি ?

—চুল বাঁধচি, এসো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো !

—গান করবে ?

—সন্দে-বেলা গান করলে শাশুড়ি আমায় ভালো চোখে দেখবেন ?একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ বাড়ির মধ্যে। সে হবে না ভাই। তবুও তুমি আজ প্রথম বললে গানের কথা।

—কেউ বলেনি বুঝি তোমায় বউদিদি ?

—কে আর বলচে !

এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল ঘন হয়ে—কামিনী চলে যাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াল। বললে—চলি আজ বউদিদি, আর একদিন আসব।

এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে সেদিন বিকেলে। সুলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে নেবুফুল ফুটেচে—বৃষ্টি সজল অপরাহ্নের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ...

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বললে—কি হচ্ছে রাঙা-বউ ?

—আসুন দিদি। কি আর হবে, এমনি বসে আছি।

রান্নাঘরে চলো। দুটো ডাল ভাজব, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে।

—আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে ?একটু অন্য রকমের কাজ—একটু ভালো কাজ...

নীরদা হেসে বললে—সময় নেই ভাই। দেখচো তো সংসারের কাজ নিয়ে বেহাতি।

—ওরই মধ্যে সময় করে নিতে হয়—

বিরক্তিতে সুলেখার মন ভরে উঠল। এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে। এরা শুধু জানে ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে।শুধু খাওয়া আর খাওয়া।

নীরদা বললে—তুমি তো রাঙা-বউ নতুন এসেচো। এখন প্রথম প্রথম তোমার খারাপ লাগবে—এর পর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অন্য কিছুতে মন যাবে না।

সুলেখা মনে মনে বললে—সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক !

চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ভাজতে বসতে হল রান্নাঘরে। দুটি ঘণ্টা সে কি খাটুনি ! নীরদা ডাল ভেজে দিচ্চে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়ছে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখেসুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়ল, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েচে। কি কর্মফলে এমন সংসারে সে এল !

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা শুনলে কে গান গাইচে...

সুলেখা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে—গুন্-গুন্- করে কে গান ভাঁজচে—নিপুণ কণ্ঠের আলাপ ! ও ভাবলে—বা রে, এমন জয়জয়ন্তী আলাপ করে কে ?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্‌গুন্-সুরে আলাপ করছে, সে নিপুণা গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করত। কিন্তু এ কি সম্ভব ?

এখানে কে গান গাইবে এমন ?

সুলেখা আরো শোনবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াল, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অন্যমনস্কভাবেই একটুকরো গান অল্প একটু সময়ের জন্যে গাইছিল—ঠিক গান গাইবার জন্যে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিস্ময়জড়িত চোখে এসে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে এ ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনে এল রাত্রের সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ঘটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা...

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায়নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, চা খেতে বসে রান্নাবান্নার গল্প করলে। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি ?এমন যে সুন্দর লাইলাক রঙের জরিপাড় শাড়ি পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারো চোখ গেল না ?কেউ বললে না সে-কথা। না বললে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুড়িয়ে-খেতে একটা বাক্যি। সুলেখা ওদের কাছে 'মায়ামুকুর'-এর গল্পটা করেছে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েচে, অথচ গান গাইতে বললেও না তাকে কেউ ! হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানে না হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর সুকণ্ঠকে ?

সুলেখার ইচ্ছে হল, এই মূঢ় অশিক্ষিত মেয়েগুলোর সামনে একবার হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারী'র কিংবা 'এবার ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব সুরপুঞ্জে ঘরভরিয়ে দেয়।

কারণ যে-বাড়িতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম ছিল সে-বাড়িতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকেলে শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছিল—বোধ হয় তাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্যেই। এ-গ্রামে কেউ বোধ হয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা।

বাড়ি ফিরে দেখলে, ওর জা তালের বড়া ভাজবে বলে তালের রস বার করচে। ওকে দেখে বললে—রাঙা-বউকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা ?

মেয়ের দল বললে—তুমি তো আর যাবে না বড়বউদি, তুমি গেলে অবিশ্যি আজ খুব ভালো হত। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে !

নীরদা বললে—বোস সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বউ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠল তখন রাত ন'টা। মেয়ের দল ইতিমধ্যে দু-দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েচে। সুলেখার এসব কাজে অভ্যাস নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায় ?এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ করতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত !

মনে পড়ল, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালির ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশি খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারক গুণ তত নেই। জিবে ভালোলাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাদ্যের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙালির স্বাস্থ্য এত খারাপ হত কি ?

বসে বসে শুধু নির্বোধের মতো একরাশ তালের বড়া ভাজা—

ওর বড় জা রান্নাঘরে ওকে বললে—রাঙা-বউ, আমার ঘর থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুয়ে নিই কুয়োতলা থেকে। বড্ড গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বললে—আলো আছে তোমার ঘরে ?

—নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড় জার ঘরে ঢুকে গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়ল একটা জিনিস।

ঘরের ছোট্ট টেবিলটার ওপর একখানা খাম পড়ে আছে, 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' ছাপ আছে তার ওপরে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র রায়গ্রাম, বাহিরগাছি পোস্ট, জেলা নদীয়া। তাড়াতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে—সতেরোই আগস্ট তারিখে নীরজাসুন্দরী মিত্রের গান আছে রেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফরম্। উল্টে-পাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাত রেডিও-কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে ?নীরজাসুন্দরী মিত্র কে ?একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগল। তাই যদি হয় ?তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বললে—এ কার চিঠি, দিদি ?নীরজাসুন্দরীকে ?

ওর জা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—দুর : ও আবার তুমি দেখতে গিয়েছো ?আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে—নীরদা।

—কিন্তু মিত্র কেন ?ঘোষ হবে তো ?

—বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও আপিসে। ওরা আর বদলায়নি। ও কিছু নয় ভাই—রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বউকে একথা বোলো না, আমার লজ্জাকরে। তাছাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসব কথা জানালে কি কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা ?হিরণ্ময় মিত্র, নাম শুনেচ বোধ হয় ?

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিষ্যা সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে ! সুলেখা শ্রদ্ধায় ও স্নেহে নিজের আঁচল দিয়ে বড়ো জার মুখ মুছে দিতে দিতে বললে—একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তাহলে আপনিই অনেক রাতে ?ঘুমের ঘোরেশুনে সেদিন—পায়ের ধুলো দিন—তখন আমি ধারণাই করতে পারিনি। এতদিন বলা উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানব ?